Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 23-34
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.045

দখল: প্রান্তিক জীবনের কবিতা পাঠ থেকে পর্দায়

ড. মোস্তাক আলি, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কালীগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.11.2025; Accepted: 08.12.2025; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Based on the story 'Amma' by Sushil Jana, Gautam Ghosh produced the film 'Dakhal' (1982 AD) and won the Swarna Kamal award. The storyteller portrays the poverty, struggle and exploitation of the primitive tribal Kakmara people, the resistance and protest of the poor proletariat against that exploitation. While following the original narrative, the director has brought out the 'multidimensional resonance' of the struggle of the nomadic tribes, the conflicts of the Indian tribal society, the unfolding of permanent vested interests in the wake of these clan conflicts and the status of women in the post-independence period. This image of deprivation, exploitation and protest can also be seen in his first short film 'Maa Bhumi' (1979 AD). The director Gautam Ghosh has created a novel in the narrative in simple language with extraordinary skill. In order to portray the past in the context of the present, sometimes he narrated the story directly through the mouth of the character and sometimes he resorted to multiple flashbacks. Likewise, he has narrated the events of the past while telling the fragmentary events of the present. The story moves multiple times from present to past, past to present. However, it did not spoil the mood of the story anywhere. In addition, the director has narrated the present story while maintaining the essence of the past story in the wonderful way- without stopping the story, he has highlighted the events of the past, the actions and reactions of the characters in the context of the present. In the first scene the arrival of the nomadic group along the river bed and in the last scene they disappear like the sand of the ford— bridging the first and the last scene, the director has shown their life flow with great skill.

Keywords: Storyteller, Poverty, Struggle, Exploitation, Kakmara people, Simple language, extraordinary skill

আদিবাসী সমাজ তথা এই সমাজে বসবাসকারী মানুষেরাই ভারত মায়ের প্রকৃত সন্তান; সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল শক্তি। অথচ দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি তাদের জীবন তথা অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে দেশের মূল চালিকা শক্তি যারা, যে শক্ত ভিতের উপরে রাষ্ট্র নামক কাঠামোটি দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম থেকেই খুবই সচেতনভাবে তাদের উপেক্ষা ও অবহেলা করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিরেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে আজও তারা নিকৃষ্ট, অস্পৃশ্য, ভোট বৈতরণী পার হবার রসদ ও ক্লান্ত-অবসন্ন জীবনের মুক্তির আকাশ— ভোগ-বিলাস যাপনের অঙ্গ। যদিও তাদের সহজ-সরল জীবন, প্রকৃতি নির্ভর সংস্কৃতি, উদারতা ও সহৃদয়তাকে মানবাত্মা গঠনের প্রথম শর্ত হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভ্যতার সংকট

থেকে মুক্তি পেতে তাদের আদি ও অকৃত্রিম জীবন, ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হতে বলেছিলেন। অথচ আমরা তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণি তাকে খুবই সচেতনভাবে পাশ কাটিয়ে গেছি, প্রতিনিয়ত নিজেদের আখর গোছাতে ব্যস্ত। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় আদিবাসী শ্রেণি অবহেলিত ও বঞ্চিত। অত্যাচার, অবিচার, অপমান ও অবমাননাই যেন তাদের ভাগ্যলেখনী। সুবিধাবাদী ইতিহাস রচয়িতাদের পাশ ঠেলে বা সমাজের শিরোমণিদের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করে যে কয়েকটি জীবন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে, সেখানেও তাদের মর্মভেদী আর্তনাদ তথা জীবন-যন্ত্রণার কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। প্রগতিবাদী কথাকার সুশীল জানা ভারত মায়ের আত্মা আদিম কাকমারা জনগোষ্ঠীর সকরুণ জীবনচিত্র— তাদের দারিদ্র্য, সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্র তুলে ধরেছিলেন 'আম্মা' গল্পে। তিন দশক পরে উক্ত গল্প-আখ্যানকে নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে সেলুলয়েডে তুলে ধরলেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। জোতদার-জমিদার শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির যে প্রতিবাদের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন গল্পকার, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সেই প্রতিবাদের স্বর যেন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এই সূত্রে পরিচালক কতকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন দর্শক তথা সমাজের শিরোমণিদের কাছে।

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'ঘরের ঠিকানা' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'আম্মা' গল্পে প্রগতিবাদী কথাকার সুশীল জানা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তথা গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য, জোতদার-জমিদার শ্রেণির শোষণ, আদিম ট্রাইব্যাল জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম এবং শোষকের শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ-সংকল্পে দুর্জয়, দুর্বার, প্রত্যয়ী ও সংগ্রামী মানসিকতার ইতিবাচকতায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। কাকমারা জনগোষ্ঠীর বাইরে বেরিয়ে জগা ও আন্দি ঘর বাঁধে, জমিতে ফসল ফলায়। কাকমারাদের চিরাচরিত পথে ঘুরে তারা ক্লান্ত, তাই তারা চরকে জ্যোৎস্না রাত্রি বানিয়ে তোলে পরিশ্রমের রক্ত দিয়ে। কিন্তু রক্তচক্ষু শোষকের করাল গ্রাস থেকে তারা ভিটেমাটিকে বাঁচাবার জন্য মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পরাস্ত করতে না পেরে শোষকশ্রেণি তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে দুর্বার জীবনীশক্তির অধিকারী আন্দি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সুতীব্র প্রতিরোধ সংকল্পে সন্তানসহ আগুনের লেলিহান শিখার কাছে দাঁড়িয়ে বাঘিনীর চোখে সে আগুনকে আহ্বান করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই মর্মবিদারক আখ্যানে লেখক অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় সহায়সম্বলহীন সর্বহারা প্রান্তিক মানুষদের সংগ্রাম ও প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন:

> "যাঁদের সহানুভূতি শ্রেণীসীমা উল্লঙ্ঘন করে প্রসারিত হয়েছে, সেই মুষ্টিমেয় স্মরণীয় মানুষদের একজন হলেন কথাকার অধ্যাপক সুশীল জানা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভূমিহারা কৃষক, নারী, খেতমজুর, নৌকার দাঁড়িমাঝি, গৃহহারা যাযাবর, কুলি ধাওড়া ও কসবী গ্যাঙের নারী দেখেছেন, তাদের পার্শ্বচর হবার বিরল সুযোগ পেয়েছেন। দেখেছেন এরাই দুর্ভিক্ষে মরে, প্রাণের চেয়ে বেশি যে মান, তা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়, আর বলি হয় পুলিশী নৃশংসতার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন ও মন্বন্তরের মানবিক পটভূমির অধ্যয়ন তাঁর লেখনীতে সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। অপিচ, এই প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে মিশেছে তাঁর অপার সহানুভূতি।"[১]

সৎ চাষির ছেলে জগা আপন ভালোবাসা, যাযাবর গোষ্ঠীর মেয়ে আন্দির জন্য পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে নির্জন চরে আন্দির সঙ্গে ঘর বাঁধে এবং চরের রুক্ষ নোনা বন্ধ্যাভূমিকে অনিমেষ সাধনা, পরিশ্রম ও প্রেমের জল সিঞ্চনে সবুজ করে তোলে। তারা সেখানকার 'মুড়াকাটি' প্রজা। একদিকে মাটির টান অন্যদিকে গার্হস্থ্য জীবনের স্থিরতায় আন্দির নোঙর-ছেঁড়া জীবনের অবসান ঘটে। জমিতে চাষ করার সময়

সাপের কামড়ে স্বামী মারা গেলে তিন সন্তানের জননী বিধবা আন্দি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভালোবাসার স্মৃতি, স্বপ্ন ও অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখে। কাকমারা জনগোষ্ঠীর যাযাবরের দল ক্লান্ত-শ্রান্ত-অবসন্ন মনে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাদের দলছুট কন্যা আন্দির ঘরে উপস্থিত হলে আন্দি তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে পূর্ব পরিচিত বাগাম্বরদের বাড়ির দাওয়ায় এক রাত্রের জন্য থাকার অনুমতি দেয়। কিন্তু ভোরবেলায় বাড়ি থেকে চলে যাবার সময়ে স্বভাবদোষে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে আন্দি তাদের অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং তারা তহশিলদার গোবিন্দ চক্রবর্তীর খপ্পরে পড়ে। জগার মৃত্যুর পরে গ্রামের জমিদার তার জমি-ভিটে হাতানোর জন্য মতলব আঁটে— যেকোনোভাবেই আন্দির ভিটে-জমিকে দখল করতে হবে। তাই, গোবিন্দ সাক্ষীর জন্য যাযাবরের দলকে বাড়িতে এনে আপ্যায়ন করে যাতে তাদের পরবর্তীতে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। সহজ-সরল যাযাবরের দল তার এই অভিসন্ধি বুঝতে পারেনি। ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসারের সামনে আন্দির চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করতে জমিদারবাড়ির কর্মচারী হারাধন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে আন্দি তার উপপত্নী, জগার মৃত্যুর পর থেকেই আন্দির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক। হাকিমের সামনে আন্দি তার বিয়ের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি। অতএব অবৈধ সম্পর্কের অবৈধ সন্তানদের জমি-ভিটের ওপর আইনত অধিকারের কোনো প্রশ্নই নেই। আন্দির সকাতর আবেদনেও তাদের মন গলে না। হাকিমের সামনে বার বার তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আন্দি ক্রোধান্ধ হয়ে হারাধনের ওপর লাফিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, 'জোর যার মুলুক তার' প্রবাদে ভর করে জমিদারের লোকজন আন্দির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কারণ, তাকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে জমি জায়গার জন্য মামলা-মকদ্দমা করে সময় নষ্ট করতে হবে না। আন্দি হাকিমের কাছে থেকে ফিরে এসে দেখে তার জীবনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবুও সে নড়ে না। আগুনের হল্কায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। বাগাম্বর আন্দিকে ভিটে-জমির মায়া ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে যাবার পরামর্শ দিলে আন্দি নির্ভীক কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'যাব! কেন যাব?' এই মাতৃভূমি, ভিটেমাটির ওপর তাদেরই অধিকার। কারণ এটা তার 'মরদের ভিটে, ব্যাটার ভিটে।' কোনোভাবেই আবার সেই নোঙর-ছেঁড়া জীবনে ফিরবে না। তাই, শত শত ইট-বৃষ্টির আঘাতেও ভেঙে না পড়ে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে অটল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে মমতাময়ী জননী নিজের তিন সন্তানকে আগলে রেখে মাতৃত্বের দুর্জয় প্রতাপ ও পরাক্রমে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো বলে, 'আসুক কে লড়াবে মোকে।' ভস্মীভূত বাড়ির নিভন্ত আগুনের লালিমাই যেন বাঘিনী আন্দির সর্বাঙ্গে জ্বলছে। জ্বলছে তার মাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রেম-ভালোবাসার অধিকারে—

> "একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে— সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ওই বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের ক্রুদ্ধ দ্যুতি।—"[২]

গল্পকার আদিম ট্রাইব্যাল কাকমারা জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, সংগ্রাম, শোষকশ্রেণির শোষণের স্বরূপ, সেই শোষণের বিরুদ্ধে দরিদ্র সর্বহারা শ্রেণির প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকে তুলে ধরেছিলেন। মূল আখ্যানকে অনুসরণ করলেও আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক যাযাবর উপজাতির সংগ্রাম, ভারতীয় আদিবাসী সমাজের দ্বন্দ্ব ও সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সুবাদে কায়েমি স্বার্থের স্বরূপ উন্মোচন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থা ইত্যাদি 'বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা'কে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিচালক বলেছেন—

> "আমাদের দেশে নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান এই ছবির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহিলারা অপ্রেসড অফ দি অপ্রেসড, প্রতি ঘরেই তাদের উপর শোষণ-নির্যাতন চালানো হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধারণায় মহিলারা সম্পত্তি আর ধনতান্ত্রিক ধারণায় পণ্যদ্রব্য। আর এই শোষণ নির্যাতনের মূল হাতিয়ার হলো অর্থনৈতিক দিক থেকে মহিলাদের পঙ্গু করে রাখা আর প্রাচীন কুসংস্কার দিয়ে ছোটবেলা থেকে তাদের মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন করা।"[৩]

এই বঞ্চনা, শোষণ ও প্রতিবাদের চিত্র তাঁর প্রথম কাহিনিচিত্র 'মা ভূমি' (১৯৭৯ খ্রি.)-তেও দেখা যায়। বিগত শতাব্দীর চারের দশকের তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত উর্দু সাহিত্যিক কৃষণ চন্দরের 'জব ক্ষেত জাগে' অবলম্বনে তেলেগু ভাষায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রে পরিচালক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ভারতবর্ষের সামন্তপ্রভু ও জায়গিরদার শ্রেণির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সশস্ত্র গণ-আন্দোলনকে তুলে ধরেছেন। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের দীর্ঘস্থায়ী সামন্তব্যবস্থা ও ভূস্বামী গোষ্ঠীর অবর্ণনীয় অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণির সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা সচেতনভাবেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত থেকেছে। ব্রিটিশ শাসকেরা নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য শাসন ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা সামন্তপ্রভু নিজাম ও জমিদার জায়গিরদার শ্রেণি বে-আইনিভাবে জোরপূর্বক তেলেঙ্গানার লক্ষ লক্ষ একর জমি দখল করে ও সাধারণ মানুষকে ভূমিদাসে পরিণত করে। দীর্ঘদিনের অত্যাচার, অবিচার ও শোষণ সহ্য করতে না পেরে তারা সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র গণআন্দোলনের ডাক দেয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার এই exploitation, এই গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতির জীর্ণ দশাকে আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক আলোচ্য চলচ্চিত্রে। এপ্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন,

> "Rural exploitation was also the theme of Gautam Ghose's earlier film MAA BHUMI. Exposition of the theme is different— and better— in DAKHAL. There is a directness, absent in the earlier film, in this tale of woman refusing to go under in the face of cruel and crafty oppression. However, the import is not under played. The story tells its tale, effectively enough, of economic sub-divisions and rural class and caste relationships. Andi is at once a victim of an unjust social order and a symbol of rebellion and hope."[৪]

তাই,

> "The film is not primarily concerned with the Kakmara community as such; the core theme is unmistakeably exploitation."[৫]

ছবির শুরুতে শীতের এক গোধূলিবেলায় কাকমারা জনগোষ্ঠীর যাযাবর উপজাতির একটি দলকে নতুন আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঘেরি নদীর পাড় ধরে আসতে দেখা যায়। অদ্ভুত জীবনীশক্তির অধিকারী জীবন্মৃত এই সহায়-সম্বলহীন সর্বহারার দল কোনোভাবেই ভেঙে না পড়ে নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধানকে নীরবে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলেছে জীবনপ্রবাহে। ছবির শেষ দৃশ্যেও তারা একইভাবে নদীর চরে বালির সমুদ্রে মিলিয়ে যায়। এই আসা ও যাওয়ার মাঝে পথশ্রমে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তারা তাদের দলছুট কন্যা আন্দির বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী হলে কিষাণ জননী বিধবা আন্দি তাদের হঠাৎ দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। যে ভালোবাসার মানুষের হাত ধরে সে অনিশ্চিত জীবনের ইতি টেনেছিল, সেই গ্লানিময় জীবনের কথা মনে করে তাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ও মায়া মমতায় শেষ পর্যন্ত তাদের রাত্রিবাসের অনুমতি দেয়। কিন্তু ভোরবেলায় আন্দির বাড়ি থেকে চলে যাবার সময় স্বভাব-দোষে ডিম, মুরগী ও দুধ ইত্যাদি চুরি করে আন্দির কাছে ধরা পড়লে আন্দি তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং তারা তহশিলদার গোবিন্দ চক্রবর্তীর খপ্পরে পড়ে ব্যবহৃত হয়ে যায়। আন্দির সঙ্গে জগা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের সাহায্যে অনাবাদি বন্ধ্যাভূমিকে উর্বর শস্য-শ্যামলা করে তুলেছিল, তাদের সেই ন্যায় দখলের এক চিলতে জমির ওপর নজর পড়ে জমিদারের। যেকোনোভাবেই সে জমি-ভিটে হাতাতে হবে। আর সে সুযোগটাকেই কাজে লাগায় জমিদার। আন্দির বাড়ি থেকে বিতাড়িত যাযাবরের দলকে কাছারি বাড়িতে ডেকে আনে। যদিও সহজ-সরল এই মানুষগুলো জমিদারের অভিসন্ধি বুঝে উঠতে পারেনি। রক্ত-জল করা জমিতে জমিদারের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে হাকিমের

সামনে তহশিলদার গোবিন্দ চক্রবর্তী আন্দির চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে এবং পরিকল্পনা মতো জমিদার বাড়ির চাকর হারাধন হাকিমের সামনে জবানবন্দি দেয়, আন্দি তার উপপত্নী। হাকিমের সামনে আন্দি তার বিয়ের কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে না এবং বিচারের সময় আন্দির স্বজাতির মানুষেরা নীরব থাকে। আন্দির জমি-ভিটের উপরে তাদের ন্যায্য অধিকার জমিদারের নামে খাসদখল হয়ে যায় অতি সহজেই। আন্দি এই অন্যায় মেনে নিতে না পেরে ক্রোধান্ধ হয়ে হারাধনের ওপর লাফিয়ে পড়ে। জমিদারের লোকজন তাকে শায়েস্তা করতে না পেরে শেষপর্যন্ত আন্দির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। কারণ জীবনগুলোকে শেষ করে দিতে পারলে ভিটেটাকে হাতানোর জন্য আর ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। সেই পোড়া বাড়ির ভগ্নস্তূপের মধ্যে আন্দি পাথরের মতো কঠিন নিষ্পলক দৃষ্টিতে বসে থাকে। অসহায় নারীর কিছুই করার থাকে না। যাযাবরের দল চলে যাবার সময় আন্দিকে তাদের সঙ্গে আসতে বললে আন্দি তাদের ডাকে সাড়া দেয় না। পোড়া ভিটেকে আগলে ধরে বলে, "যাব। কেন যাব?...যাও তোমরা, মোর যাওয়া হবেনি।"[৬] আন্দি সকাতরে তার শেষ অবলম্বন ভূটে ও শামলিকে ডাকে। অসহায় যাযাবরের দল বালির সমুদ্র পার করে চলে যায়। ঝড়ে বালি ওড়ার মতো যেন তাদের জীবনের স্পন্দন হারিয়ে যায়।

> "আমার মনে হয় আমাদের ছবি হওয়া উচিত বাস্তবধর্মী ও সমাজ সচেতন। আঙ্গিক ও প্রয়োগ হবে বোধগম্য, সহজ সরল, অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। কোনো যুক্তি দিয়েই আমরা অস্বীকার করতে পারব না আমাদের দর্শক ও তাদের বাস্তব অবস্থাকে।"[৭]

'বাস্তবধর্মী ও সমাজ সচেতন' আলোচ্য চলচ্চিত্রেও পরিচালক গৌতম ঘোষ সহজ-সরল ভাষায় অসাধারণ নৈপুণ্যে আখ্যান বর্ণনায় অভিনবত্ব সৃজন করেছেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের চিত্র তুলে ধরতে কখনও সরাসরি চরিত্রের মুখ দিয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছেন আবার কখনও একাধিক ফ্ল্যাশব্যাকের আশ্রয় নিয়েছেন। তেমনি বর্তমানের টুকরো টুকরো ঘটনা বলার ফাঁকে ফাঁকে অতীতের ঘটনাপঞ্জির বর্ণনা দিয়েছেন। কাহিনি একাধিক বার বর্তমান থেকে অতীত, অতীত থেকে বর্তমানে চলাফেরা করেছে। যদিও তাতে কোথাও গল্পের মেজাজ ক্ষুণ্ণ হয়নি। এছাড়া পরিচালক অসাধারণ মুনশিয়ানায় অতীত কাহিনির রেশ বজায় রেখেই বর্তমানের কাহিনি বর্ণনা করেছেন—কাহিনিকে না থামিয়ে বর্তমানের প্রেক্ষিতে অতীতের ঘটনা, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। প্রথম দৃশ্যে নদীর চর বেয়ে যাযাবর দলের আসা এবং শেষ দৃশ্যে চরের বালির মতো তাদের মিলিয়ে যাওয়া অর্থাৎ প্রথম ও শেষ দৃশ্যের সেতুবন্ধনে অসাধারণ দক্ষতায় পরিচালক তাদের জীবনপ্রবাহকে তুলে ধরেছেন।

আত্মীয়-স্বজনহীন নির্জন দ্বীপে বসবাসকালে ভূটে ও শামলির কৌতূহলের নিরসনে আন্দির সঙ্গে ছেলে-মেয়ের কথোপকথনের দৃশ্যটি পরিচালক আশ্চর্য নিপুণতায় তুলে ধরেছেন। ভালোবাসার জন্য একদিন জগার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্জন চরে যখন ঘর বাঁধে তখন সে গর্ভবতী। ছেলে ভূটেকে এই কথাগুলো বলার সময় 'শামলি তখন' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক কাট করে তার অতীত জীবনের ঘটনাকে তুলে ধরলেন অসাধারণ মুনশিয়ানায়। অন্য একটি দৃশ্যে দেখা যায়, মাগন আন্দিকে বলে জমিদারের লোকেরা হয়তো ঘুষ দিয়ে জরীপ সাহেবকে হাত করে জগার সব জমি ভিটে নিজের নামে করে নিয়েছে। যদিও সে নিজে অনেক বলে-কয়ে হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছে। এই কথা শুনে ন্যায় বিচারের আশায় আন্দি মাগনকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনের আগেই হাকিম সাহেবের কাছে দেখা করতে গেলে তার দেখা না পেয়ে ফিরে আসে। মাগন আন্দিকে ভালোবাসতো। ফেরার পথে মাগন তার মনের ভাব ব্যক্ত করলে সতীসাবিত্রী নারী আন্দির কাছে তার কোনো মূল্য পায় না। কারণ স্বামীই তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। গুরুত্বপূর্ণ এই সিকোয়েন্সে পরিচালক মন্তাজের আশ্রয়ে অসাধারণ দক্ষতায় আন্দি ও জগার সুখ-দুঃখ পীড়িত জীবনের নানা

মুহূর্ত, ভূটের জন্ম ও বেড়ে ওঠার চিত্র তুলে ধরলেন। ক্লোজ আপ-এ তাদের রোমান্টিক মিলনের উষ্ণতার দৃশ্যের রেশ বজায় রেখে ম্যাচ কাট করে ক্লোজ আপ-এ তুলে ধরলেন প্রতিবেশী মতিকাকার বাড়িতে উনুনে গুড় ফুটছে এবং শামলি ও ভূটে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ক) "ভূটে ।। মা মোদের কেউ নাই?
আন্‌দি ।। আছে, তোর কাকা জ্যাঠারা আছে এগরার দিকে। তারাও আসে না আমরাও যাই না। আর আসবেই বা কেন, সেই যে মানুষটা একদিন সব ছেড়েছুড়ে চলে এলো...
ভূটে ।। কে মা?
আন্‌দি ।। তোর বাপ, আমিও দল ছাড়লম! তারপর ঘুরতে ঘুরতে এই চরে এসে ঠেকলম।
মিউজিক
শামলি তখন...
ভোর। বিস্তীর্ণ নদীর মোহনা। পাতলা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে একটা নৌকা এগিয়ে আসছে। জলে দাঁড় পড়ার ছপ ছপ শব্দ। গলুয়ের পাশে ঝুঁকে আন্‌দি উকি তুলছে। বোঝা যায় যে গলায় তেতো ঠেকছে কিন্তু বমি হচ্ছে না। মাগন আর জগা বসে বিড়ি টানছে।
জগা ।। একটু জল দেবো?
আন্‌দি মাথা নেড়ে না জানায়। উঠে বসে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে।"[৮]

খ) "আন্‌দি ।। তুই যা মাগন।
আন্‌দি নেমে আসে ঘরের দিকে। মাগন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। হাওয়াই ওর চাদর উড়ছে। আন্‌দি বেড়ার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছনের দিকে চর জুড়ে অন্ধকার নামছে। আকাশে লালচে আভা নীল হয়ে আসছে। চরের ওপর শোঁ শোঁ করে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।... আন্‌দির মুখে আস্তে আস্তে একটা আলো এসে পড়ে। আন্‌দি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।... ঢেঁকির পাড় পড়ছে। একটা পা উঠছে নামছে। আলতা লাগানো।
ধানের ওপর কাঠের পাড় পড়ছে।
সধবা আন্‌দি ঢেঁকি ভাঙছে। কপালে সিঁদুর। পরনে গোলাপি শাড়ি। ঘর্মাক্ত কপাল।...
কাঠ চেরার আওয়াজ শোনা যায়।
আন্‌দি ঘুরে তাকায়।
বলিষ্ঠ জগা কাঠ চিরছে।
আন্‌দির চোখ। কপালে সিঁদুর। তাকিয়ে দেখছে জগাকে।
জগা কাঠ কাটছে। উঠোনে লাল লঙ্কা শুকাচ্ছে। পেছনে টাঙানো কাপড়গুলো হাওয়ায় উড়ছে।
জগার মুখ ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। চরের মাটি ফালা করে লাঙল এগোচ্ছে। জগা জমি চষছে। ওর ঘর্মাক্ত পেশী ওঠানামা করছে।
জগার পিঠ। বিন্দু বিন্দু ঘাম রাত্রির আবছা আলোয় দেখা যায়। আন্‌দির হাত ওকে আলিঙ্গন করে। হাতের শাঁখাটা দুলে ওঠে। জগা, আন্‌দি সঙ্গমরত। আন্‌দির কপালের সিঁদুর লেপটে গেছে। জগার মুখ স্থির। আন্‌দির চোখ বন্ধ। আঁকড়ে ধরে আছে জগার শরীর। আন্‌দির শরীর শিথিল হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা কেঁদে ওঠে। মিউজিক মিলিয়ে যায়। আন্‌দি মুখ ঘোরায়। আস্তে আস্তে হাত বাড়ায় পাশে শুয়ে থাকা কয়েক মাসের শামলির দিকে। মার হাতের সঙ্গ পেয়ে আস্তে আস্তে চুপ করে যায় শিশু।

মতিকাকার বাড়ি। রাত্রি।
বিরাট একটা কড়াইয়ে গুড় জাল হচ্ছে।
গরম গুড় ফুটছে। এক মহিলা কাঠের হাতা দিয়ে গুড় নাড়ছে। আরও কয়েকটা বাচ্চার সঙ্গে ভূটে শামলি লোলুপ চোখে বসে আছে। একটু দূরে ঘরের ভেতর লণ্ঠনের আলো ঘিরে কয়েকটা বাচ্চা 'সহজপাঠ' পড়ছে। দূর থেকে আন্‌দির গলা শোনা যায়।
আন্‌দি ।। ভূটে... শামলি...
শামলি ।। ভূটে মা এসেছে। চল।
ভূটে করুণভাবে গরম গুড়ের দিকে তাকায়।"[৯]

আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক লিখিত আখ্যানের যে যে অংশ **পরিবর্তন ও পরিবর্জন** করেছেন সেগুলো হল:

ক) লিখিত আখ্যানে আন্দি কাকমারাদের কথাবার্তা ও হইচই শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, আন্দি যখন পুকুরে বাসন মাজছিল তখন শামলি পুকুর ঘাটে এসে মা-কে কাকমারাদের আসার কথা বলে।

খ) 'আম্মা' গল্পে আন্দি ও জগার তিন ছেলে। চলচ্চিত্রে সেখানে আন্দি ও জগার দুই সন্তান–শামলি ও ভূটে।

গ) গল্প-আখ্যানে ভালোবাসার জন্য জগা নিজের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে আন্দিকে নিয়ে ঘর বাঁধে। জগার আদি নিবাস 'উত্তর দেশে'। অন্যদিকে চলচ্চিত্রে জগার আদি নিবাস এগরা।

ঘ) তহশিলদার জরিপসাহেবকে ঘুষ দিয়ে বে-আইনিভাবে আন্দি-জগার রক্ত-জল করা জমি খাস দখল করে। এজলাসের দিন হাকিম সাহেবের সামনে তহশিলদার গোবিন্দ চক্রবর্তী আন্দিকে বেশ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে জমিদার বাড়ির চাকর হারাধনের সঙ্গে আন্দির অবৈধ সম্পর্কের কথা, আন্দির জাত তুলে কথা বললে হাকিম সাহেব মুচকি হেসে তাতে সায় দেয় পরোক্ষভাবে। চলচ্চিত্রে, হাকিম সাহেবকে অন্যভাবে দেখা যায়। তহশিলদার জরিপসাহেবকে ভুল বুঝিয়ে জগার জমি আত্মসাৎ করতে গেলে হাকিম সাহেব জানান আইন মেনে তার বিচার হবে।

ঙ) জগার জমি তহশিলদারের চক্রান্তে খাসদখল হয়ে গেলে মাগন সুবিচারের আশায় অনেক অনুরোধ ও অনুনয়-বিনয় করে হাকিম সাহেবের কাছে দেখা করার অনুমতি পায়। এতেই ঘা লাগে জমিদারের। তাই জমিদারের পেয়াদারা তাকে ভিটে ছাড়া করতে ভয় দেখায় ও প্রাণে মারার হুমকি দেয়। যাতে তারা বিনা বিচারে তাদের জমি-জায়গা হাতাতে পারে। চলচ্চিত্রকার জমিদারের পেয়াদাদের হুমকির অংশ বর্জন করেছেন। মাগনের মুখে তাদের জমি জমিদারের নামে খাসদখলের কথা শুনে এজলাসের জন্য ধার্য নির্দিষ্ট দিনের আগেই আন্দি মাগনকে নিয়ে হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং দেখা করার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসে।

চ) হাকিম সাহেবের এজলাসে বিচারের দিনই জমিদারের পেয়াদারা আন্দির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে অন্ধকার থেকে আন্দিদের আঘাত করতে থাকে। ঢিলের আঘাতে আন্দি ও তার মেজ ছেলে আহত হয়। চলচ্চিত্রে দেখা যায়, আন্দি সুবিচার না পেয়ে বাড়ি ফিরে এলে জমিদারের লোকেরা তার বাড়ি আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢিল মারার প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন পরিচালক।

ছ) লেখক আন্দির চরিত্রে তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ দ্যুতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সে বাঘিনীর মতোই আগলে রেখেছিল নিজের সন্তান ও মাতৃভূমিকে। অন্যদিকে পরিচালক আন্দির জীবনের একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের চিত্রকে তুলে ধরেছেন। যাযাবরের দল একসময় চলে যায়। শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত সংকেতধর্মী শেষ দৃশ্যটিতে পরিচালক সময়ের কঠোর বাস্তবতায় তাদের চলে যাওয়ার দৃশ্যটি হাওয়ার গতির সঙ্গে নদীর চরে বালি মিলিয়ে

যাওয়াকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তাদের জীবনের সুর যেন মিলিয়ে যায়। আন্দি তার শেষ অবলম্বন ভূটে ও শামলির মধ্যে ভরসা খোঁজার চেষ্টা করে। লিখিত আখ্যানের (১৯৫২ খ্রি.) সময় থেকে কয়েকটি বছর (১৯৮২ খ্রি.) পেরিয়ে গিয়ে সেই দ্যুতি অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

গল্পকারের বর্ণনায়:

"ব্যাপারটার গভীরত্ব বুঝেই বোধ হয় বুড়ো বাগাম্বর গেল সান্ত্বনা দিতে, 'ও সব ঝুটমুটের জন্যে দুখ করিসনি বেটি। মোরা কাকমারার জাত! ওরা যখন তাড়াবেই তো চল মোদের সঙ্গে। দল বসে আছে তোর জন্যে। কেউ যাইনি মোরা—চল।'...

মাগন একটা হাত চেপে ধরল আন্দির 'চল আন্দি—সরে চ—আর এক দণ্ড হেথা লয়।'

'না'—

হঠাৎ ফেটে পড়া একটা সবল কণ্ঠ নিস্তরঙ্গ মরা অন্ধকারকে যেন আলোড়িত কম্পিত করে তোলে মুহূর্তে, 'আসুক কে লড়াবে মোকে।'

তিনটি ছেলেকে ঘিরে অটল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল আন্দি—নড়ল না এক পা। একটা রাঙা আভা ঝলমল করছে অন্ধকারে—সেটা যেন নিভন্ত খড়কুটোর নয়, সে ওই বাঘিনী মেয়েটার রাঙা চোখের আগুন, ওর সর্বাঙ্গের ক্রুদ্ধ দ্যুতি।"[১০]

পরিচালকের ক্যামেরায়:

"বাড়ির একটু দূরে কাকমারাদের দলটা দাঁড়িয়ে। ওদের বিষণ্ণ মুখগুলোর ওপর ক্যামেরা ঘুরতে থাকে। বাগাম্বর এগিয়ে আসে। উঠোনে উঠে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে যায় আন্দির দিকে।

বাগাম্বর।। বেটি।

আন্দি যেন সম্বিত ফিরে পায়। মুখ তুলে বাগাম্বরের দিকে তাকায়।

বাগাম্বর।। চল মোদের সঙ্গে। দল দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যাইনি মোরা।... এ সব ঝুটমুটের জন্য দুঃখ করিসনি... মোরা কাকমারার জাত। চল। যাবি?

আন্দি।। যাব। কেন যাব?... যাও তোমরা। আমার যাওয়া হবেনি।

বাগাম্বর কোন উত্তর দিতে পারেনা। আস্তে আস্তে ওঠে। হেঁটে এগোতে থাকে। ভোরের কাকলি, গরুর হাম্বা হাম্বা, হাঁসের ডাক, মুরগির ডাক এই সব শব্দ বাড়তে থাকে।

চারপাশে প্রাত্যহিক জীবনের স্পন্দন।

আন্দি দাঁড়িয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েদের খোঁজে। আওয়াজ বাড়তে থাকে।

আন্দি।। ভূটে...শামলি...

বিস্তীর্ণ চর। আবছা অন্ধকার নেমেছে। তীব্র বেগে বালু রাশি উড়ে চলেছে। কাকমারার দলটা যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে যাচ্ছে। বড় বালির ঢিবিটাকে পেছনে রেখে ভ্রাম্যমাণ কাকমারার দলটা মিলিয়ে যাচ্ছে। বালি উড়ছে। ঝড় বাড়ছে। বালি উড়ছে..."[১১]

উপরে উল্লেখিত অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ছাড়াও পরিচালক নিম্নলিখিত অংশগুলি **সংযোজন** করেছেন:

ক) সমাজের নিম্নবর্গে অবস্থানকারী আদিবাসীরা ভারত মায়ের প্রকৃত সন্তান হলেও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তারা যেন নিজভূমে পরবাসী। তারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে শত শত অপমান, নিপীড়ন, অত্যাচার নীরবে সহ্য করে জীবন নির্বাহ করে। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনকে তুলে ধরতে পরিচালক প্রথমেই দেখিয়েছেন, তারা কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত। গোবিন্দর অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে কাকমারার দলটি কাছারি

বাড়িতে যায়। একটি দৃশ্যে দেখা যায় একই পাত পেড়ে মানুষ ও কুকুর খাচ্ছে। এই দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে পরিচালক বহমান সমাজব্যবস্থায় তিক্ত কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরলেন।

খ) জমিদার নিত্যানন্দের সঙ্গে গোবিন্দর কথোপকথন ও বোঝাপড়া সেই সঙ্গে গরিব মানুষের রক্ত চুষে তৈরি হওয়া অট্টালিকার বিবরণ জানান দিয়ে যায় শত শত কৃষকের আর্তনাদ। যাদের লুট ও হত্যা করে শবের সমাধিকে যারা জীবন্ত সলিল করে চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামন্তপ্রথা, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপের জন্য আইনের প্রবর্তন হলেও তারা সদম্ভে সেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছলে-বলে-কৌশলে সেই বনেদিয়ানাকে বহাল তবিয়তে বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাই, আন্দি-জগার রক্ত-জল করা পরিশ্রমের ফসল, এক চিলতে জমিকে বে-আইনিভাবে জোরপূর্বক দখল করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। নিজের ও পরবর্তী প্রজন্মের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা করে যেতে না পারলে তাদের যে মান থাকবে না। এই দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে পরিচালক স্বাধীনতা পরবর্তীকালের জমিদার-জায়গিরদার শ্রেণির শোষণের স্বরূপ ও ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থার গ্রামীণ সমাজ-অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরেছেন—

> "জমিদার বাড়ির দোতলার ঘর। বিকেল পড়ে সন্ধ্যা নামছে। একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘর দেখা যায়। ঐ ঘরে পালঙ্কের উপর জমিদার নিত্যানন্দ জানা বসে। ঘরে আবছা আলো। খলনোড়ার আওয়াজ শোনা যায়। ঢং ঢং করে ঘড়ির ঘণ্টা বাজে।
>
> বাড়ির চাকর ঘরের ভেতর সেঁজবাতি ধরিয়ে দেয়। ঘরে আলো বেড়ে যায়।
>
> জমিদার খলনোড়ায় স্বর্ণসিন্ধুর মধু দিয়ে মেখে চেটেপুটে খায়। ওর হাতের আংটিগুলোতে নানা গ্রহরত্নের সমাবেশ। পরনে একটা সিল্কের ফতোয়া ও ধুতি। একটা দামী শাল কোলের ওপর বিছানো।
>
> দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে বাড়ির চাকর ঝোলান আলোটা জ্বালিয়ে বাতির সৌখিন কাঁচের দরজাটা বন্ধ করে। বাতির গায়ে চিনে কালির নানারঙের ফুল আঁকা।
>
> সিঁড়ি দিয়ে গোবিন্দ তহশীলদারকে উঠে আসতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে ওঠে। গোবিন্দ দাঁড়িয়ে প্রণাম করে। জমিদার নিত্যানন্দ জানাকেও কপালে হাত রেখে বিড়বিড় করতে দেখা যায়। শাঁখের শব্দ মিলিয়ে গেলে জমিদার গোবিন্দকে দেখতে পেয়ে ভেতরে ডাকে।
>
> নিত্যানন্দ।। এসো...কি খবর?
>
> গোবিন্দ।। আজ্ঞে, পলাশপুরের জমিটা দেবত্তর হয়ে গেছে।
>
> নিত্যানন্দ।। কত জমি?
>
> নিত্যানন্দ পাশের টেবিলে রাখা জমির নক্সাগুলো টেনে নামায়।
>
> গোবিন্দ।। বিঘে তিরিশেক হবে।
>
> নিত্যানন্দ।। আতস কাঁচ দিয়ে জমির নক্সা পরীক্ষা করে।
>
> নিত্যানন্দ।। কিন্তু খাসদখলের কি হল? তালুকমুলুক কতো আর থাকছেনি আগের মত। সব এবার থেকে খাজনা দেবে সরকারের ঘরে।
>
> গোবিন্দ।। আজ্ঞে দক্ষিণের চর নিয়ে বেগ পেতে হবেনি।
>
> নিত্যানন্দ।। দক্ষিণের চর। ও দিয়ে হবেটা কি শুনি। ও তো ডাহা লোনা, নিচু জমি।
>
> গোবিন্দ।। আজ্ঞে, অমন একখানা দিঘী।
>
> নিত্যানন্দ।। দীঘি না জলা। আমার চরের পুব দিকটা খাস চাই। তল্লাটের সেরা জমি।
>
> গোবিন্দ।। সেও হয়ে যাবে। আপনাকে ভাবতে হবেনি।

নিত্যানন্দ।। ভাবছি কি আর সাধে... চৌদ্দপুরুষের জমিজমা তাও নাকি সরকারকে লিখে দিতে হবে। ক্ষতিপূরণ যে কি দেবে, কবে দেবে কে জানে।...বলে কিনা পঁচিশ একরের বেশী খাস রাখতে দেবে না। গুষ্টি সুদ্ধ খাওয়াবোটা কি?... তোমার তহশীলদারিই বা থাকবে কোথায়, ভেবে দেখেছ? গোবিন্দ হাঁ করে শোনে।

নিত্যানন্দ।। কি যে সব আইনকানুন হচ্ছে।

গোবিন্দ।। আইনের কথা বাদ দিন কত্তা। আইন যখন থাকছে, আইনের ফাঁকফোকরও থাকবে।... তবে কিনা পূব চরটা নিয়ে ঝামেলাটা একটু বেশি।

নিত্যানন্দ।। কেন!

গোবিন্দ।। জগা পাইক...ওর ভোগদখলের জমিজমা হাতিয়ে এনেছি। এই দেখুন কাগজপত্র।...

গোবিন্দ।। ঝামেলা মানে ওর বিধবাটা আবার একটা আপিল করে বসে আছে।

নিত্যানন্দ।। আপিল! জগার বিধবা? ও সেই কাগমারা মাগীটা।

গোবিন্দ।। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল তার এজলাস বসছে। নিত্যানন্দ আতস কাঁচ রেখে পাশে টেবিলে রাখা সাদা পাথরের গেলাসে চুমুক দেয়। ওর ঠোঁটে দুধ লেগে থাকে।

গোবিন্দ।। আজ্ঞে এখন তো আর সেদিন নেই যে লেঠেল পাইক পাঠিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল। দিনকাল বদলাচ্ছে। দেশ স্বাধীন হল। নিত্যনতুন আইন হচ্ছে। নইলে একটা জমির দখল নিতে হাকিম মোক্তারের কাছে দরবার করতে হয়!"[১২]

গ) জীবনের নানা দুর্বিপাক ও অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আন্দি ও জগা রুক্ষ অনুর্বর জমিকে উর্বর শস্যশ্যামলা করে তোলে। এ যেন তাদের নন্দনকানন। এই নন্দনকানন আক্রান্ত হয় জমিদারের দ্বারা। আন্দি তা মেনে নিতে পারে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা সবুজ শ্যামলিমাকে আন্দি সন্তানস্নেহে আঁকড়ে ধরে। পরিচালক এই দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে কৃষিনির্ভর জীবন ও চাষির সঙ্গে জমির একাত্মতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"সন্ধ্যা নামছে। পশ্চিম আকাশে শেষ আলো মিলিয়ে যায়। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে।

আন্‌দির ঘরের ভেতর। রান্নাঘরে আন্‌দি আর ভূটে বসে। খানিকটা দূরে ঘরের অন্ধকার কোণে শামলি। উনুনের একপাশে বসে আন্‌দি চুন হলুদ গরম করে পায়ে লাগাচ্ছে। ভূটে চুপ করে বসে। কুপির আলো কাঁপছে। অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে শামলির অস্ফুট কান্নার শব্দ শোনা যায়। আন্‌দি মুখ ঘোরায়।

আন্‌দি।। শামলি।

শামলি কোনো উত্তর দেয় না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

আন্‌দি।। এদিকে আয়।

শামলি উঠে আসে। আন্‌দির বুকে মুখ গুঁজে কাঁদে।

আন্‌দি।। কাঁদছিস কেন? বোকা মেয়ে কি হয়েছে।... সারাদিন তোদের কিছু খাওয়া হয়নি।... শামলি তুই ভাতটা বসা, আমি ক্ষেত থেকে দুটো সবজি তুলে আনি।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় রহস্যময় লাগে চারদিক। ক্যামেরা আন্‌দির বাড়ির সংলগ্ন সবজি ক্ষেতের উপর দিয়ে চলেছে।

[মিউজিক]

আলোছায়ায় ঘেরা পথ দিয়ে আন্‌দি এগিয়ে আসে। ওর চুল খোলা। কপালে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে। আন্‌দি এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায়, তাকিয়ে থাকে সবজি বাগানের দিকে— ওদের বহু পরিশ্রমে তৈরি অপূর্ব বাগান। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায়। ক্যামেরা দূরে সরে যায় গাছ গাছালির ভেতর দিয়ে। আন্‌দি হেঁটে চলেছে।

কপি গাছের সারি ধরে ক্যামেরা চলেছে। সবুজ ক্ষেত শিশিরে সিক্ত। আন্‌দি দুহাতে একটা কপি তোলে। ওর হাত শিশিরে ভিজে যায়। কপিটা সন্তানের মত বুকে আঁকড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। আন্‌দি একা নিঃসঙ্গ ক্ষেতের ওপর কাঁদতে থাকে। কান্নার শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়।"[১৩]

ঘ) শোষক শ্রেণি নিজেদের মেদ বৃদ্ধির জন্য কখনও আইনকে ফাঁকি দিয়ে, কখনও বা আইনের সহায়তায় সর্বহারা শ্রেণির ওপরে নির্বিচারে উৎপীড়ন, নিপীড়ন চালায়। শোষক শ্রেণির সুবিধার্থে এজলাস বসলেও শোষিত, নিপীড়িতদের স্বার্থ দেখা হয় না। পরিচালক কতকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন সমাজ তথা রাষ্ট্রের কাছে। যাদের জন্য এই আইন প্রবর্তন করা হল, তারা কি কোনোদিন ন্যায়বিচার পাবে?

"গোয়ালের এক কোণে আন্‌দি বসে আছে। ওর মুখ পাথরের মত কঠিন, নিষ্পলক দৃষ্টি।...মতিকাকা আস্তে আস্তে হেঁটে আসে।... কেউ কোন কথা বলছে না। মতি কাকা খানিকটা নিজের মনেই বলে ওঠে—

মতিকাকা।। লোভ লোভ, এক ছটাক জমির জন্য কত খুনখারাবি দেখলাম।... এত পাপ ভগবান সইবে নি।

ক্যামেরা গাঁয়ের লোকদের সারি সারি মুখ ধরে।

মতিকাকা।। ওই যে নদী...ওর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁধ বেঁধেছি। নোনা মাটি... নোনা মাটিতে আবাদ করে ফসল ফলিয়েছি।... এর কিছু মানে আছে, যুক্তিও আছে।... অন্ধকারে আন্‌দির ঘরটা যে জ্বালিয়ে দিল! এর যুক্তি কি? এর জন্য কি এজলাস বসবে? বল, বলতো তোমরা?"[১৪]

প্রগতিবাদী কথাকার সুশীল জানার 'আম্মা' গল্প অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে পরিচালক গৌতম ঘোষ মূল আখ্যানের অনুসরণে সহজ সরল ভাষায় অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে আখ্যান বর্ণনায় অভিনবত্ব সৃজন করেছেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের চিত্র তুলে ধরতে যেমন ফ্ল্যাশব্যাকের আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি কাহিনিকে না থামিয়ে বর্তমানের টুকরো টুকরো কাহিনির রেশ বজায় রেখেই অতীতের ঘটনাপঞ্জি, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরেছেন। লেখক বিশ শতকের পাঁচের দশকের প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা তথা সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য ও বৈষম্যহীন নতুন সমাজ গঠনের চিত্র এঁকেছিলেন, মূল আখ্যানের অনুসরণ করলেও আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক নারীর একক সংগ্রাম, আদিম জনজাতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্বকে কীভাবে সুবিধাবাদী শ্রেণি ব্যবহার করে তার চিত্রকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বাগ, খোকন কুমার। সম্পাদনা। অন্তর্মুখ। পর্ব ৬, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ৮।

২. জানা, সুশীল। সুশীল জানার শ্রেষ্ঠ গল্প। বুকমার্ক, আগস্ট ১৯৬৩, পৃ. ১৩৬।

৩. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। সংখ্যা ৮, অক্টোবর ১৯৮২, পৃ. ১০৬, ১০৭।

৪. Bandyopadhyay, Samik. Edition.Indian Film Culture 1, April 1983, P. 54.

৫. Bandyopadhyay, Samik. Edition.Cinewave 3, October 1982, P. 72.
৬. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। ২য় বর্ষ, মার্চ ১৯৮২, পৃ. ৩৮।
৭. বেরা, অবনীন্দ্রনাথ। সম্পাদনা। চলচ্চিত্র সমালোচনা ৫০। সুজন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৭২।
৮. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। ২য় বর্ষ, মার্চ ১৯৮২, পৃ. ২০, ২১।
৯. তদেব, পৃ. ৩০, ৩১।
১০. জানা, সুশীল। সুশীল জানার শ্রেষ্ঠ গল্প। বুকমার্ক, আগস্ট ১৯৬৩, পৃ. ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬।
১১. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। ২য় বর্ষ, মার্চ ১৯৮২ পৃ. ৩৮।
১২. তদেব, পৃ. ২৮, ২৯, ৩০।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫, ৩৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৩৭, ৩৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ:

১. জানা, সুশীল। সুশীল জানার শ্রেষ্ঠ গল্প। বুকমার্ক, আগস্ট ১৯৬৩।
২. বেরা, অবনীন্দ্রনাথ। সম্পাদনা। চলচ্চিত্র সমালোচনা ৫০। সুজন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সহায়ক পত্রিকা:

১. বাগ, খোকন কুমার। সম্পাদনা। অন্তর্মুখ। পর্ব ৬, সংখ্যা ২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬।
২. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। সংখ্যা ৮, অক্টোবর ১৯৮২।
৩. রায়, সন্দীপ। সম্পাদনা। কল্পনির্ঝর। ২য় বর্ষ, মার্চ ১৯৮২।
৪. Bandyopadhyay, Samik. Edition.Indian Film Culture 1,April 1983.
৫. Bandyopadhyay, Samik. Edition.Cinewave 3,October 1982.